নারীর জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন নয়া উদারবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত থেকে দেখা

ওমর তারেক চৌধুরী

প্রেক্ষাপট

দু'হাজার সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের ১৫৬টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের উপস্থিতিতে ১৮৯টি দেশ সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করেছিল 'সহস্রাব্দ ঘোষণা' এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'। ২০১৫ সালের মধ্যে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অক্ষরজ্ঞানহীনতা, পরিবেশের অবক্ষয়, নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং মাতৃস্বাস্থ্যসহ স্বাস্থ্য বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু উন্নতির লক্ষ্যে সময়-নির্ধারিত ও পরিমাপযোগ্য উপায়ে আটটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত হয়েছিল বহুল আলোচিত এই 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'। চলতি বছর 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' গৃহীত হবার এক দশকপূর্তি হচ্ছে। এ উপলক্ষে এ বছরের ২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন পর্যালোচনা ২০১০' শীর্ষ সম্মেলন আয়োজিত হবে আবারো নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দফতরে। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন আর মাত্র পাঁচ বছর বাকি আছে, তখন অবশিষ্ট সময়ে কার্যকর সাফল্য অর্জনের জন্য বিগত ১০ বছরের কার্যক্রমের আলোকে মূল লক্ষ্যমাত্রার সীমাবদ্ধতার পর্যালোচনা হওয়া ও তা কটিয়ে ওঠার চেষ্টা করাই হবে কাঙ্ক্ষিত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়ে এই চেষ্টা হওয়া উচিত। আরো দীর্ঘমেয়াদিভাবে, এমনকি ২০১৫ সালের পরেও এ নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে। তেমনই কিছু পর্যালোচনা এই নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। সে পর্যালোচনায় যাবার আগে প্রয়োজন 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' গৃহীত হবার বৈশ্বিক এবং দেশীয় প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার।

নয়া উদারবাদের হাতে দরিদ্র, নারী ও পরিষেবা খাতের রক্তক্ষরণ

গত শতকের ৮০-র দশক থেকে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর মতো বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মুরুব্বি প্রতিষ্ঠানসমূহ 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস' নামে পরিচিত একটি রক্ষণশীল মতাদর্শিক কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্বের ঘাড়ে মুক্তবাজার অর্থনীতির জোয়াল চাপিয়ে দিয়েছিল। 'নয়া-উদারবাদী' এই ব্যবস্থায় 'কাঠামোগত সমন্বয় নীতি'র মাধ্যমে আসলে সামাজিক সেবাখাতে ব্যয় কমাতে এবং রাষ্ট্র কর্তৃক জনহিতকর কার্যক্রমগুলোর বিলুপ্তি সাধনে বাধ্য করা হয়েছে বহু দেশের সরকারকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাধারণ মানুষ এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড়ো ও প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছে নানাভাবে। স্বভাবতই, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণে নারীর ওপর এর অভিঘাত পড়েছে সবচেয়ে নির্মমভাবে। নয়া-উদারবাদী পন্থার অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে মুক্তবাজার চালু করার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা বা সরকারি ভূমিকার বিলুপ্তি ঘটানোর শর্ত পূরণ করা (অর্থাৎ, শ্রমিকের স্বার্থ, পরিবেশরক্ষা, নিরাপদ কর্মস্থলের নিশ্চয়তা, ভোক্তা-গ্রাহকদের স্বার্থ ইত্যাদিকে জলাঞ্জলি দিয়ে মালিকের

মুনাফা বৃদ্ধিকে প্রাধান্য দান করা)। নয়া উদারবাদী পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকারসমূহকে বাধ্য করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় খাতের বিলোপ ঘটিয়ে জনগণের সম্পত্তি (অর্থাৎ, দুর্নীতি কমানো বা দক্ষতা বৃদ্ধির অজুহাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক-বিমা, হাসপাতাল, জলাভূমি, প্রাকৃতিক সম্পদ; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ; টেলিফোন, বিমান, রেল পরিবহণের মতো পরিষেবাসমূহ ও শিল্পখাত) জলের দরে বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দিতে; রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে নাগরিকদের শিক্ষা, চিকিৎসা নিশ্চিত করার দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিতে; এবং পানীয় জল, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গণপরিবহণ, বন্দর, যোগাযোগ ইত্যাদির মতো পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিসগুলোর সেবাদান নিশ্চিত করার বৈশিষ্ট্যের বদলে মুনাফা করার জন্য এই খাতগুলোকে বেসরকারি মালিকানায় মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য ছেড়ে দিতে। এ সবই হচ্ছে এই জনবিরোধী মতাদর্শের আবশ্যিক অঙ্গ। অভ্যন্তরীণ খাদ্য-নিরাপত্তা, শিল্প ও কৃষিখাতে আত্মনির্ভরশীলতা নিশ্চিত রাখার বিপরীতে আমদানি-নির্ভরতা বৃদ্ধির উপযুক্ত বাণিজ্যিক ও আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কর ও শুল্কব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে সরকারগুলোর হাত মোচড়ানো ছিল নয়া উদারবাদী পন্থার প্রধান-প্রধান দিক।

এই হাত মোচড়ানোর জন্য চালু করা হয় কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি বা স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (স্যাপ)। সকল ধরনের ঋণ, অনুদান বা কর্মসূচির সঙ্গে স্যাপ-এর বাস্তবায়ন একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়। প্রথমত, বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় দাতাসংস্থার চাপে অবাধ বাণিজ্য বা মূলত আমদানি নীতি উদারীকরণ, রাষ্ট্রের ভূমিকা ও দায়িত্ব খর্ব করা, সামাজিক খাতে ব্যয় সংকোচন, রাষ্ট্রায়ত্ত উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান খাত বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া এবং রাষ্ট্রীয় ভরতুকি প্রত্যাহার করার মতো নয়া উদারবাদী নীতি সংস্কারের শর্ত অত্যাবশ্যকীয় করা হয় স্যাপ বাস্তবায়নের জন্য।

শুধু সরকারি নীতি পরিবর্তন করার মাধ্যমেই এগুলো সাধিত হয় নি। নীতি পরিবর্তনের জন্য সরকারকে চাপ দেবার পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে বৈশ্বিক স্তরে অত্যন্ত জোরালোভাবে ব্যাপক আকারে মতাদর্শিক প্রচারণাও চালানো হয় গণমাধ্যম, সরকারি আমলাতন্ত্র, দাতাদের সেবাদানকারী দেশি-বিদেশি কনসালট্যান্ট এবং এমনকি আন্তর্জাতিক এনজিও ও দাতাদের ওপর নির্ভরশীল দেশি এনজিওদের মাধ্যমে। এই প্রচারণার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মূল সমস্যা ও কারণগুলোকে আড়াল করে মানুষকে বোঝানো হতে থাকে যে, সরকারি খাত সবসময়ই সরকারি নিয়ন্ত্রণের কারণে অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়; এ থেকে সাধারণ মানুষ কোনোভাবে লাভবান হয় না। সাধারণ মানুষের ওপর বোঝাস্বরূপ এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো সেবা ও মুনাফা পেতে এগুলোকে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিলে দুর্নীতি দূর হবে, দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং মুক্তবাজারের সাধারণ নিয়মে প্রতিযোগিতার ফলে সেবা ও পণ্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আসার মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে। এই প্রচারণার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও ও 'সিভিল সোসাইটি' গ্রুপ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে; ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষায়িত এনজিও গড়ে তোলা হয় এ কারণে। আমাদের চর্তুদিকে সচেতন দৃষ্টি মেললে আমরা এসব প্রচারণা ও কুশীলবদের উপস্থিতির প্রমাণ পাব অনায়াসে। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশ ও ভারতের রেলওয়ে ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন টেলিফোন কোম্পানিসহ অনেক খাতের অর্জন ও কৃতকর্মের মধ্যে তুলনা থেকে এসব প্রচারণার অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই ধরা পড়বে।

১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থান থেকে শুরু হওয়া লাগাতার সেনাশাসনের জমানায় বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ক্রমশ বেশিমাত্রায় এই ধরনের কর্মসূচি নিয়ে স্থান করে নিতে শুরু করে বাংলাদেশে। এটা কোনো আশ্চর্য হবার মতো বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার ছিল না। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বদাই স্বৈরশাসকদের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে; কেননা, তাতে করে

জবাবদিহিবিহীন ও দুর্নীতিবাজ শাসকদের সহায়তায় বিনা বাধায় তারা সহজেই উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, নয়া উদারবাদের প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৩ সালে চিলির গণতান্ত্রিক সরকারকে রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। স্বৈরতান্ত্রিক সামরিক সরকারের কথা বলার মানে এই নয় যে, আমাদের মতো দেশের নির্বাচিত সরকারগুলো কম দুর্নীতিপরায়ণ ও মদদদাতা এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা করতে তারা অনিচ্ছুক।

সামরিকজান্তাদের হাত ধরে শুরু করে, বাংলাদেশ প্রায় দুই দশক ধরে প্রত্যক্ষভাবে স্যাপের নিগড়ে থেকে শিল্প, কৃষি, আর্থিক খাত এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো পরিষেবা খাতে প্রচুর রক্তক্ষরণের শিকার হয়। সেই নীতিপরিমণ্ডল থেকে আমাদের সরকার এখনো বের হয়ে আসে নি। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, দেশ পরিচালনাকারীরাও নিজেদের শ্রেণিস্বার্থে এর থেকে বের হয়ে আসতে চায় না। মূলত পিআরএসপি বা দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র ইত্যাদি চটকদার মুখোশের আড়ালে জনবিরোধী নয়া উদারবাদী সেই পন্থা সেজন্য এখনো অনুসৃত হয়ে আসছে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা দরকার যে, সাম্প্রতিক সময়ে যে দলগুলো আমাদের এখানে সরকার পরিচালনা করেছে, এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে। যেমন, বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা ও ভূমিকা বাড়াবার বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং পাট খাতকে পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য কয়েকটি বেসরকারিকৃত শিল্পকারখানা শ্রমিকদের ব্যবস্থাপনার ফিরিয়ে আনা হয়েছে[১]।

দেশীয় অর্থনীতি, কৃষি ও শিল্পের ভিত্তি ধ্বংসের উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, নয়া উদারবাদী পন্থায় স্যাপের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বিগত ৯০-এর দশকে শুধু পাটশিল্প খাতে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল ৫০ শতাংশ; যা কার্যত এ খাতে নিয়োজিত ঋণের টাকার অপচয় বৈ কিছু নয়। সে সময় বন্ধ করে দেয়া হয় ১৮টি পাটকল এবং ছাঁটাই করা হয় ২০,০০০ শ্রমিককে। নয়া উদারবাদী এই সংস্কার কর্মসূচি পরবর্তী দশকেও অব্যাহত থাকে; যার ফলে বৃহত্তম পাটকল আদমজী বন্ধ হয়ে গেলে ১৩ হাজারের বেশি দক্ষ শ্রমিক এক ধাক্কায় তাদের জীবনজীবিকা থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়। স্কুল থেকে ছিটকে পড়ে শ্রমিক পরিবারের সন্তানরা। এই কারখানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পুরো একটি জনপদ কার্যত রাতারাতি সামাজিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে নানাভাবে। বাংলাদেশে ১৯৯৫-'৯৭ সালে ৮৯ হাজার শ্রমিককে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায়। স্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাই করে নিয়োগ দেয়া শুরু হয় অস্থায়ী পদে। এই বিপুল পরিমাণ শ্রমিককে জীবিকাচ্যুত করার ফলে এসব শ্রমিকের পরিবার, বিশেষ করে নারী সদস্যদের ওপর কী তীব্র মাত্রার প্রভাব পড়েছিল তা আমরা কেবল অনুমান করে নিতে পারি।

বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী হিসেবে একাধিকবার দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকে বেগম মতিয়া চৌধুরী বিভিন্ন সময় উল্লেখ করেছেন যে, স্যাপের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনকে বিলুপ্ত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ, ভরতুকি, সম্প্রসারণ সেবার মতো সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত করার ফলে কৃষিখাতে উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া থেকে শুরু করে ভেজাল, দুর্নীতি, পরিবেশগত বিপর্যয়ের মতো ক্ষতিকর দিকগুলো এই খাতের সমূহ ক্ষতি সাধন করেছে। খাদ্যের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে উপেক্ষা করে উর্বর আবাদি জমি বিনষ্ট করার মাধ্যমে রপ্তানির জন্য চিংড়ি চাষের মতো ক্ষতিকর পন্থাকে উৎসাহিত করে ব্যাপক আকারের পরিবেশগত ও সামাজিক বিপর্যয়ের সূচনা করা হয়। এসব প্রবণতার অন্যতম শিকার হয় দেশের দরিদ্র ও নারী জনগোষ্ঠী।

[১] এসব শিল্পকারখানার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে নিবন্ধকারে কাছে কোনো তথ্য নেই।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে স্যাপের কারণে। সর্বসাধারণের জন্য প্রচলিত সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে দুর্বল করার পাশাপাশি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুনাফার জন্য বেসরকারি স্বাস্থ্যখাত গড়ে তোলার নীতি-পরিবেশ তৈরি করা হয়। শিক্ষাখাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। এই পর্যায়ে সরকারিভাবে শিক্ষাখাত যে পরিমাণে উপেক্ষিত হয়, তার ফল এখনো বয়ে যেতে হচ্ছে দেশকে। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে একটি পরিসংখ্যানই হয়ত এই উপেক্ষার তীব্রতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। অতি সম্প্রতি বর্তমান সরকার নতুন ১৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেবার আগে ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত দেশে সরকারি উদ্যোগে নতুন কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অপরদিকে স্যাপের নীতি-পরামর্শের অধীনে ক্রমাগতভাবে বেসরকারি মালিকানায় পরিকল্পিতভাবে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাদানের দায়িত্ব ছেড়ে দেবার সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা হলেও এসব ক্ষেত্রে সেবার মান নিশ্চিত করার জন্য সরকারি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করা হয় নয়া উদারবাদী ভাবধারার সঙ্গে সংগতি রেখে। ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত না-করে ঢালাওভাবে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে একদিকে সেবাপ্রাপ্তি যেমন ব্যয়বহুল হয়ে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি গড়ে ওঠে নি জবাবদিহি করার কোনো বাধ্যবাধকতা। সর্বোপরি ক্ষুণ্ন হয়েছে মানুষের অধিকার ভোগ করার রাষ্ট্রীয় নিশ্চয়তা। 'সুশাসন' কথাটি নয়া উদারবাদের অন্যতম একটি প্রিয় বুলি হলেও, এসব ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ রাখাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হয় বেসরকারি মালিকানার পৃষ্ঠপোষকতার স্বার্থে। 'সুশাসন' কথাটি জমা রাখা হয় কেবল রাষ্ট্রীয় খাতকে 'অদক্ষ', 'অপব্যয়ী,' 'দুর্নীতিপরায়ণ' ইত্যাদিতে অভিহিত করে একটি দানবিক চেহারা দেবার জন্য।

বাংলাদেশে জনবিরোধী নয়া উদারবাদী অর্থনীতির নেতিবাচক অভিজ্ঞতাকে অর্থনীতিবিদ আনু মুহাম্মদ সারসংক্ষেপ করে বলেছেন : '...জ্বালানি খাতে জাতীয় সক্ষমতার অবক্ষয় ও বিদেশি মালিকানার সম্প্রসারণ, ... আমদানি নির্ভরতা বৃদ্ধি, মিল থেকে মলমুখী (শপিং) অর্থনৈতিক তৎপরতার বিস্তার, চট্টগ্রাম স্টিল মিল, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরিসহ বহু শিল্পকারখানা বন্ধ, বহু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পানির দামে বিতরণ, রেলওয়ে সংকোচন, দখল ও লুণ্ঠন প্রক্রিয়ায় জনগণের সাধারণ সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তর, কৃষিখাতে হাইব্রিড বীজসহ কোম্পানি নির্ভরতা বৃদ্ধি, চোরাই টাকার তৎপরতা বৃদ্ধি, কাজ ও মজুরির নিরাপত্তা সংকোচন, বাণিজ্য ঘাটতির ক্রমান্বয় বৃদ্ধি এবং নতুন ধনিক শ্রেণির জন্ম ও বিকাশ।' এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে নয়া উদারবাদী অর্থনীতির বিষাক্ত ছোবলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের রক্তক্ষরণ এবং উন্নয়নের চাকা উলটোদিকে ঘুরিয়ে দেবার মাত্রাটি অনুধাবন করা যেতে পারে।

নয়া উদারবাদের স্থানিক ও বৈশ্বিক চেহারা

উপরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় নয়া উদারবাদের যে চেহারার সামান্য আভাস আমরা পেলাম, সেটি শুধু বাংলাদেশের একক কোনো ছবি নয়। আশির দশক থেকে শুরু হওয়া এবং বিশেষত একের পর এক সমাজতান্ত্রিক দেশে পটপরিবর্তনের পর নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক মতাদর্শ পরিপূর্ণ শক্তিতে সারা পৃথিবীর ওপরই চেপে বসে নগ্নভাবে। কিন্তু তার আগেই মার্গারেট থ্যাচার ও রোনাল্ড রেগানের জমানায় এর নগ্ন চেহারা দেখা দিতে থাকে ব্রিটেন ও আমেরিকার মতো দেশগুলিতে। সেই জমানায় এর প্রধান আঘাত নেমে আসে সেখানকার শ্রমজীবী মানুষের ওপর। নয়া উদারবাদ শ্রমজীবী নারী-পুরুষের অবদানকে অস্বীকার করে। তাদের মঙ্গল ও উন্নয়নে সকল ধরনের বিনিয়োগ বন্ধ করার জন্য প্রবর্তন করে 'নো ফ্রি লাঞ্চ' নামক মন্ত্র। যার প্রকৃত মানে হচ্ছে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নয়, শিক্ষা থেকে প্রসূতি সেবা— সবকিছু 'মুক্তবাজার' থেকে কিনে নিতে হবে। নয়া উদারবাদ এই মন্ত্র জপলেও মন্ত্রটি সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে কার্যকর করতে মোটেই উৎসাহী নয়। তার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া যাবে আমাদের দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে। সাম্প্রতিক বিশ্বমন্দার অজুহাত তুলে বাংলাদেশের বিভিন্ন

শিল্পের জন্য ২০০৯-'১০ অর্থবছরের বাজেটে ৫০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয় প্রণোদনা প্যাকেজ হিসেবে। সমভাবে "২০১০-'১১ অর্থবছরের বাজেটে রপ্তানি বাণিজ্যে বৈরী অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় ২,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ প্রস্তাব করা হয়েছে।" এ ধরনের সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিস্তারিত আলোচনা ও বিতর্কের দাবি রাখে অবশ্যই। এর বিপরীতে সংক্ষেপে প্রশ্ন তোলা যায় যে, এসব ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ সাধারণ মানুষের অর্থে বহন করা হলেও আর্থিক সহায়তা পাওয়া খাতগুলোর সাধারণ শ্রমজীবী নারী-পুরুষরা কি এই 'ফ্রি লাঞ্চে'র কোনো হিস্যা পাবেন? অবশ্যই পাবেন না। এ ধরনের 'ফ্রি লাঞ্চ' বিতরণ নিয়ে নয়া উদারবাদের প্রবক্তা প্রতিষ্ঠানগুলো কখনোই চিন্তিত নয়। তারা তখনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, যখন সরকারি খরচে গরিব মানুষের জন্য চিকিৎসা সেবার কথা ওঠে; স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের কথা বলা হয় বা নাগরিক সেবার জন্য বিআরটিসি'র মতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কথা বিবেচনা করা হয়।

বৈশ্বিক পরিসরেও এমন অবস্থা বিরাজমান। সাম্প্রতিক বিশ্বমন্দায় পাশ্চাত্যের দেশগুলির দুর্নীতিপরায়ণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে উদ্ধার করার জন্য সেসব দেশের সাধারণ মানুষের অর্থ বা 'ফ্রি লাঞ্চ' একইভাবে ব্যয় করা হয় (গত ডিসেম্বরে শুধু ব্রিটেনের ব্যাংকগুলিকে বাঁচাবার জন্য বরাদ্দ করা হয় ৮৫০০ কোটি পাউন্ড, আমেরিকান কর্মকর্তারা অনুমান করছেন যে চূড়ান্তভাবে এ খাতে তাদের, প্রকৃতঅর্থে সাধারণ মানুষের, ব্যয় দাঁড়াবে ২৩,০০০,০০০,০০০,০০০ ডলার)। আমেরিকার তিনটি মোটরগাড়ি কোম্পানির প্রধান নির্বাহীরা ব্যক্তিগত জেট প্লেনে চড়ে (!) মার্কিন কংগ্রেসে হাজির হয়েছিলেন ২৫ বিলিয়ন ডলারের 'বেইলআউট প্যাকেজ' নামক ভিক্ষা নেবার জন্য[২]। এ বছরের ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্টের ব্যয় হয়েছে ১,০৭৬,৬৫২,০৭৫,৩২৮ মার্কিন ডলার। বিশেষ করে বিগত তিন দশক ধরে সরকারি ভরতুকির মুণ্ডুপাত করা হলেও সাধারণ মানুষের টাকায় বেসরকারি খাতকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে নয়া উদারবাদের প্রবক্তারা 'ফ্রি লাঞ্চ'-এর প্রবচনটি অবলীলায় ভুলে যেতে কুণ্ঠিত হয় না।

অথচ, ২০০০ সালে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হবার সময় ঠিক হয়েছিল যে, উন্নতবিশ্বের দেশগুলি এমডিজি বাস্তবায়নের জন্য তাদের জাতীয় আয়ের ০.৭০ শতাংশ বরাদ্দ করবে। এক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় নি। ২০০৮-এ শুধু ডেনমার্ক, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে ও সুইডেন তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে এক্ষেত্রে। বর্তমানে এই প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে ০.৩০ শতাংশ। সহায়তাদানের অন্যান্য খাতেও রয়েছে এমন ঘাটতি। এমন পরিস্থিতিতেও বিশ্বব্যাপী সামাজিক উন্নয়ন, ন্যায়বিচার, নারী ও শিশুর অগ্রগতি, পরিবেশ সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত কিছু করতে বিশেষ আগ্রহী নয় নয়া উদারবাদী পন্থার অনুসারী দেশগুলি। সম্ভবত, উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলির জনগণের চাপই তাদেরকে বাধ্য করতে পারে উন্নয়ন খাতে সম্পদ নিয়োজিত করতে।

এমডিজির আবির্ভাব ও রক্তক্ষরণ-শুশ্রূষার সম্ভাবনা

নয়া উদারবাদী 'ওয়াশিংটন কনসেনসাস' যখন ওয়াশিংটনভিত্তিক বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে বল্গাহীনভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নকে কার্যত ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সেই সময় নতুন সহস্রাব্দের সন্ধিক্ষণে জাতিসংঘ তাদের বিগত কয়েক দশকের বিভিন্ন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'র ধারণাটি নিয়ে এগিয়ে আসে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৫তম সভাটি মিলেনিয়াম অ্যাসেমব্লিতে রূপ নেয়। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে

[২] জেনারেল মোটর্স, ফোর্ড ও ক্রাইসলার কোম্পানির তিন নির্বাহীপ্রধানই বিলাসবহুল পৃথক জেট প্লেনে করে ডেট্রয়েট থেকে ৫২৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ওয়াশিংটন ডিসিতে তাদের কোম্পানি তিনটির জন্য উদ্ধার প্যাকেজ সংক্রান্ত মার্কিন কংগ্রেসের শুনানিতে হাজির হলে পর সারা দুনিয়ায় সংবাদ শিরোনাম হয়ে ওঠেন তাঁরা। জিএম-এর নির্বাহীর বিলাসবহুল উড়োজাহাজটির মূল্য ছিল ৩৬ মিলিয়ন ডলার। গাড়িতে এই দূরত্ব যাবার জন্য খরচ হয় ৮০ ডলারের পেট্রোল।

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্বের ১৫৬টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের উপস্থিতিতে ১৮৯টি দেশ সম্মিলিতভাবে গ্রহণ করে 'সহস্রাব্দ ঘোষণা' এবং 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'। পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অসুস্থতা, অক্ষরজ্ঞানহীনতা, পরিবেশের অবক্ষয় এবং নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে, সময়-নির্ধারিত ও পরিমাপযোগ্য উপায়ে আটটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত হয় 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'। ইতঃপূর্বে জাতিসংঘ কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের অধিকার রক্ষা বিষয়ক সনদের চেতনার সাথে সংগতি রেখে প্রণীত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' কিছুমাত্রায় হলেও নয়া উদারবাদী মডেলের সৃষ্ট ক্ষতকে সারাতে অবদান রাখবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষের সমস্যা মোকাবিলায় সহায়ক হবে বলে আশা করার কারণ রয়েছে। পনেরো বছরব্যাপী এই লক্ষ্যমাত্রার দুই-তৃতীয়াংশ সময় অতিক্রান্ত হবার সন্ধিক্ষণে অনেক দেশের ক্ষেত্রেই তেমন লক্ষণাবলি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাও আমাদেরকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতির প্রমাণ উপহার দিচ্ছে। নয়া উদারবাদী মতাদর্শের অভিঘাতে জর্জরিত ও তিক্ত অবস্থার সামনে মানব ও সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে এসব অর্জন কিছুটা হলেও স্বস্তির অবস্থা তৈরি করেছে। আটটি লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত যে ১৮টি লক্ষ্যমাত্রা বা টার্গেট অর্জনের (৫০টি পরিমাপযোগ্য সূচক বা ইন্ডিকেটর) জন্য বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ, তার মধ্যে যেগুলিতে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো হলো : ১. চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল (ছয়টি সূচকের মধ্যে তিনটিতে সঠিক পথে ও দুটিতে নেতিবাচক। সকল ক্ষেত্রেই কিছু সূচক সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় নি।), ২. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন (তিনটি সূচকের মধ্যে একটিতে সঠিক পথে ও একটিতে নেতিবাচক), ৩. নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন (পাঁচটি সূচকের মধ্যে তিনটিতে সঠিক পথে ও দুটিতে নেতিবাচক), ৪. শিশুমৃত্যুহার হ্রাস (তিনটির সূচকের মধ্যে তিনটিতেই সঠিক পথে), ৫. মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন (সাতটি সূচকের তিনটিতে নেতিবাচক, কোনো ইতিবাচক অবস্থা নেই), ৬. এইআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ (দশটি সূচকের মধ্যে আটটিতে সঠিক পথে), ৭. টেকসই পরিবেশ (দশটি সূচকের মধ্যে তিনটিতে সঠিক পথে ও একটিতে নেতিবাচক)। এই দশ বছরে সহস্রাব্দ লক্ষ্য অর্জনের যে দুটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো, তা হচ্ছে : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলেশিক্ষার্থীদের মধ্যে কেবল স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে সংখ্যাগত সমতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এবং ১৯৯০ সালের তুলনায় শিশুমৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ হ্রাস করা গিয়েছে। শুধু বাংলাদেশই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এমন ইতিবাচক অর্জন সাধিত হয়েছে এশিয়ার ভিয়েতনাম, মঙ্গোলিয়া, ভুটান, লাওস, নেপাল, চীন ও কম্বোডিয়া; আফ্রিকার বতসোয়ানা, উগান্ডা, রুয়ান্ডা, মালাউই, জাম্বিয়া, ইরিত্রিয়া, মালি, দক্ষিণ আফ্রিকা, সেনেগাল, ইকুয়েটরিয়াল গিনি, মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া, নাইজার, তাঞ্জানিয়া ও গায়েনা; উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, কোস্টারিকা ও গুয়াতেমালায়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা আন্তর্জাতিকভাবে নয়া উদারবাদী কাঠামোর মধ্যেই বা সেই কাঠামোর নৈতিক অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ না-করেই প্রণীত হয়েছে।[৩] শুধু

[৩] সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যকে সঠিক প্রেক্ষিতে অনুধাবন করতে হলে মনে রাখতে হবে যে, এই উদ্যোগটি দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোর কাছ থেকে আসে নি। উদ্যোগটি মূলত সামনে ঠেলে দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান এবং সাথে ছিল বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, অর্থনৈতিক সহায়তা ও উন্নয়ন বিষয়ক সংগঠন (ওইসিডি)। এই সংশ্লিষ্টতা থেকে প্রশ্ন ওঠে যে উদ্যোগটি মূলত নয়া উদারবাদী আদর্শিক বিষয়কে ঢাকার উদ্যোগ কি না। এই নিবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণে না-গিয়ে, অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য করে বা প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, যা এ নিবন্ধ ও লেখকের সীমাবদ্ধতা। বাস্তবসম্মত পর্যালোচনার জন্য সামির আমিন লিখিত The Millennium Development Goals: A Critique from the South (মান্থলি রিভিউ। মার্চ ২০০৬) শীর্ষক নিবন্ধটি দেখা যেতে পারে।

তাই নয়, বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন লক্ষমাত্রার (আইডিজি) সাথে এর যেমন সাজুয্য রয়েছে, তেমনি এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও রয়েছে সমন্বয় করার প্রয়াস। এখানে মূল লক্ষণীয় বিষয় হলো এমডিজি মূলত দারিদ্র্য পুনরুৎপাদনকারী, পরিবেশ ধ্বংসকারী, দরিদ্র মানুষের প্রতি বৈরী এবং অন্যায্য নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের দাবি উত্থাপনের ক্ষেত্রে নীরব থাকলেও তা কিছু পরিমাণে হলেও দরিদ্রমুখী অবস্থান নেয়। উপরন্তু, বিশ্ব পর্যায়ে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্য থেকে সৃষ্ট সমস্যাগুলির প্রতি ব্যাপকভাবে এক ধরনের নাগরিক ও জাতীয় সচেতনতা সৃষ্টিতে লক্ষণীয় অবদান রাখে। যার ফলে নয়া উদারবাদ সৃষ্ট রক্তক্ষরণে কিছুমাত্রায় শুশ্রূষার সুযোগ তৈরি হয়।

কিন্তু, সীমাবদ্ধতাও আছে

বিশ্ব পর্যায়ে সহমতের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক (২০০৫ সালে উন্নয়নশীল বিশ্বেই দিনে ৭০ টাকার চেয়ে কম উপর্জানকারী ১৪০ কোটি মানুষ) দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূর করে স্বাস্থ্যসেবা, জীবনরক্ষা, শিক্ষার উন্নতিকল্পে কতগুলো সর্বজনস্বীকৃত সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য এমডিজি গৃহীত হয়েছিল। এই সদিচ্ছার মধ্যেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা যে রয়ে গেছে তা অনস্বীকার্য। দশ বছর অতিক্রান্ত হবার পর, বা এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন আর মাত্র পাঁচ বছর বাকি আছে, কার্যকর সাফল্য অর্জনের জন্য সেসব সীমদ্ধতার দিকে ফিরে তাকানো ও তা কটিয়ে ওঠার চেষ্টা করাই হবে কাঙ্ক্ষিত। এই চেষ্টা হওয়া উচিত দু'পর্যায়েই— জাতীয় পর্যায়ে এবং ২০ থেকে ২২ সেপ্টেম্বরের 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন পর্যালোচনা ২০১০' শীর্ষ সম্মেলন পর্যায়ে। আরো দীর্ঘমেয়াদিভাবে, এমনকি ২০১৫ সালের পরেও এ নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ

আটটি এমডিজির মধ্যে মূলত দুটি (৩ ও ৫) লক্ষ্যে সুনির্দিষ্টভাবে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবকটি লক্ষ্য কার্যকরভাবে অর্জনের জন্য প্রতিটি লক্ষ্যের ক্ষেত্রেই জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন ছিল। এমডিজির এই সীমাবদ্ধতার সমালোচনা বৈশ্বিক নারী আন্দোলন থেকেও উত্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার না-থাকা, ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে নারীর প্রতি সহিংসতা এবং নারীর যৌন ও প্রজনন অধিকারের অস্বীকৃতি আমাদের নারীসমাজের অগ্রগতির পথে বিরাট বাধা। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের জন্য করা গবেষক প্রতিমা পাল-মজুমদারের প্রকাশিতব্য সমীক্ষায়ও সম্পত্তির ওপর বাংলাদেশের নারীর সমঅধিকার না-থাকা থেকে সৃষ্ট বাধাগুলো অপসারণের গুরুত্বের কথা উঠে এসেছে। জাতিসংঘের সহস্রাব্দ ঘোষণাতে মানবাধিকার সংক্রান্ত সকল চুক্তি ও ঘোষণার স্বীকৃতি থাকলেও এমডিজির কোনো সূচকে এগুলোর কোনো প্রতিফলন নেই। এমডিজির কোনো লক্ষ্যেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি লক্ষ্য ও সূচক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। আটটি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের (দারিদ্র্য দূরীকরণ, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা, শিশুমৃত্যু হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্য, ম্যালেরিয়া বা এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, পরিবেশের স্থায়িত্ব এবং উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন) ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের জন্যও নারী অধিকারের প্রশ্নটি নিশ্চিত করা ছাড়া সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেই কেবল স্থায়িত্বশীল সামাজিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হতে পারে।

নারীর ওপর ধর্মীয় রক্ষণশীলতার আঘাতকে মোকাবিলা করতে হবে

নারীর যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সংক্রান্ত অধিকারসহ অনেক অধিকারের বিষয়ে এমডিজি যে কোনো নির্দেশনা দেয় না তা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা না-করার কারণ রয়েছে। নয়া উদারবাদী প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের সঙ্গে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা প্রসারের যোগসূত্র রয়েছে। এই যোগসূত্রের বিষয়টি উন্নতবিশ্বের

দেশগুলোতেও অত্যন্ত স্পষ্ট। সে কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশেই নারীর শরীরের ওপর বা তাদের প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ে অধিকারহীনতার বিষয়টি একটি বাস্তব সমস্যা। অনেক দেশেই আজও গর্ভপাত ঘটানোর পর্যাপ্ত সুযোগ ও অধিকার নেই। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় ফিরে আসলে আমরা দেখতে পাব যে, নারীর প্রতি ধর্মীয় রক্ষণশীলতা থেকে উদ্ভূত আঘাত; যেমন, ফতোয়াবাজি, দোররা মারা, সম্পত্তির ওপর সমঅধিকার স্বীকৃত না-হওয়া ইত্যাদি নারীর সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা থেকে আসা আঘাত প্রায়শই এমনকি নারীর প্রতি সহিংসতা ও শারীরিক হুমকি তৈরি করে থাকে। এসব অন্তরায় নিশ্চিতভাবে প্রতিহত করার জন্য এমডিজিতে কোনো লক্ষ্য বা সূচক দৃশ্যমান নয়। এর অবশ্য যৌক্তিক কারণ রয়েছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রায় দশকব্যাপী বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যখন এমডিজি গৃহীত হয়, তার মধ্যেই বহু দেশের অভ্যন্তরে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদীদের তৎপরতা এবং এমনকি উন্নত বিশ্বসহ উন্নয়নশীল অনেক দেশের সরকারের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় গোষ্ঠী ও ডানপন্থী শক্তিগুলোর প্রভাব এবং নয়া উদারবাদী মতাদর্শ অনেক বিষয়ে জাতিসংঘকে পেছনে ঠেলে নিয়ে যায়। নারীর ওপর এসব পশ্চাৎপদ শক্তি বিভিন্ন সময়ে যেসব অপতৎপরতা পরিচালনা করে তা নারীর মানবাধিকারকে ক্ষুণ্ন করার পাশাপাশি তার সমতা অর্জন ও ক্ষমতায়নের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। তাই, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যে নারীর মানবাধিকার রক্ষার বিষয়টিকে নিশ্চিত করা দরকার জরুরিভাবে।

নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক মডেলের অন্তর্ভুক্ত থাকা এবং তাকে বৈধতা দেয়া

এমডিজি যে দেশে বাস্তবায়িত হয়, সেখানকার বিদ্যমান সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার, অর্থাৎ নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার পটভূমিতেই তা রূপলাভ করে। তাই সংগত কারণেই নয়া উদারবাদী রাজনৈতিক-অর্থনীতির জনবিরোধী নীতির চাপ এর ওপর পড়ে অনিবার্যভাবে। কিন্তু সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক অর্থনৈতিক কাঠামো অপসারণের কথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলা প্রয়োজন। তাহলেই কেবল সম্ভব হবে এমডিজির সার্থক বাস্তবায়ন। জাতিসংঘ এবং বাস্তবায়নকারী সদস্য রাষ্ট্রগুলো থেকে জোরালোভাবে তা না-করার সুদূরপ্রসারী ফলাফল হচ্ছে এটি বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের মতো নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধানতম প্রবক্তা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং তাদের চাপে ও ভাবাদর্শে প্রণীত জনবিরোধী উন্নয়ন নীতিমালাকে জাতিসংঘের মাধ্যমে কর্তৃত্ব ও বৈধতা দান করার সুযোগ পায়।

উত্তরণের জন্য দরকার

কোনো উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে টেকসই হতে হলে তাতে নারী ও মেয়েশিশুদের স্বার্থকে সর্ববিধভাবে রক্ষা করার বিষয়ে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। 'সহস্রাব্দ ঘোষণা' গৃহীত হবার সময় সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, কায়রো ও বেইজিং সম্মেলন, সিডও এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অধিকারসংক্রান্ত সনদ প্রভৃতির মতো পূর্ববর্তী নানা অভিজ্ঞতা ও আন্দোলন থেকে অর্জিত চেতনা ও কর্মপন্থাকে যেভাবে গুরুত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল, 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা'য় নারীর অধিকারসংক্রান্ত বিষয়গুলি সেভাবে প্রতিফলিত নয়। দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী ফলাফল অর্জনের চেয়ে এখানে স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য পূরণ গুরুত্ব পেয়েছে অনেক বেশি।

বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, আমাদের সংবিধানে নারীর জন্য সমানাধিকারের কথা বলা হলেও বাস্তব জীবনে তার প্রতিফলনের বদলে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। উত্তরাধিকারসূত্রে পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকার বা ক্ষেত্রবিশেষে অধিকার না-থাকা নারীর জন্য একটি বড়ো বাধা। এটি নারীকে এমনকি অনেক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুবিধা গ্রহণ থেকেও বঞ্চিত করে এবং নারীর জন্য সামগ্রিকভাবে একটি অবহেলা ও বঞ্চনার আবহ তৈরি করে। এই ধরনের মৌলিক অধিকারগুলি নিশ্চিত

না-করে স্বল্পস্থায়ী ইতিবাচক কিছু অর্জিত হতে পারে অবশ্যই। কিন্তু নারীর অবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের জন্য সকল ক্ষেত্রে নাগরিক হিসেবে তার অধিকার নিশ্চিত করা একটি জরুরি বিষয়। নাগরিক হিসেবে নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে যা অর্জিত হবে তাই কেবল নারীর স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক অধিকার ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতার ভিত রচনা, নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করা এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মতো মৌলিক পরিবর্তনগুলোকে স্থায়ী রূপ দিতে পারে। সেটাই আমাদের কাম্য।

কাজেই, সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নির্ধারিত অবশিষ্ট সময়ে একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হবে জাতীয়ভাবে নারীর জন্য নাগরিক হিসেবে প্রাপ্য সকল ধরনের অধিকার আদায়ের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে আসা। এই কাজটি আন্তর্জাতিক পরিসরেও করা প্রয়োজন। আমাদের 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা'র পূর্ণ বাস্তবায়ন এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একইভাবে সিডও সনদের যে দুটি ধারার ওপর এখনো আমাদের সরকার সংরক্ষণ বজায় রেখেছে, তা তুলে নিয়ে সিডও সনদের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নারীর সমতা অর্জন ও ক্ষমতায়নের প্রশ্নটিকে ইতিবাচক রূপ দিতে পারে।

স্থায়িত্বশীল সামাজিক উন্নয়ন, নারীর জন্য সমতাসম্পন্ন পরিবেশ, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীবান্ধব আর্থ-সামাজিক আবহ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সহমর্মী মতাদর্শ ও ভূমিকা সবচেয়ে বড়ো অবদান রাখে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে, নয়া উদারবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে নির্মিত রাষ্ট্রীয় ও উন্নয়ন নীতিমালা রাষ্ট্রকে সেই ইতিবাচক ভূমিকা পালন থেকে সরিয়ে ক্রমশ তাকে জনবিরোধী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন উদ্যোগের সেবকে পরিণত করে। এর ফলে সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাগরিক উদ্যোগগুলোর জন্য একটি বৈরী পরিবেশ তৈরি হয়। অর্জিত উন্নয়ন সাফল্যগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।

তাই সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সাফল্যকে ধরে রাখতে হলে নয়া উদারবাদী মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সকল নীতি ও কার্যক্রমকে প্রত্যাখান করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। নারীর সমানাধিকার ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরেও আমাদের রাষ্ট্রের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নেবার জন্য সক্রিয় হতে হবে।

ওমর তারেক চৌধুরী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ। otc1960@gmail.com

সহায়ক সূত্র

1. Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia: 'What is Neoliberalism? A Brief Definition for Activists'. National Network for immigrant and Refugee Rights. January 1, 1997.
2. Bangladesh Experience with Structural Adjustment by Dr. Debapriya Bahttacharya and Rashed Al Tituumir. SAPRI, Bangladesh.
3. Structural Adjustment: The Policy Roots of Economic Crisis, Poverty and Inequality. The SAPRI Report. Zed Books, London. 2004.

৪. 'উন্নয়ন দর্শন ও বরাদ্দের ফাঁকি' । আনু মুহাম্মদ । *প্রথম আলো*, ২২ জুন ২০১০

5. Taking a Private Jet to Hold Out a Tin Cup. *The New York Times*. November 19, 2008

6. http://www.radiofeminista.net/julio05/notas/mdg-ing.htm

7. http://www.awid.org/eng/Issues-and-Analysis/Library/MDG-Goals-Panned-for-Isolating-Women-s-Rights

8. Millennium Development Goals: At a Glance. UN Department of Public Information. Updated April 2010.

9. Factsheet: Where are the Gaps. www.un.org/esa/policy/mdggap